BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link :: https://doi.org/10.70798/Bijmrd/020500021

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 2| Issue: 5| June 2024| e-ISSN: 2584-1890

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে অর্থনৈতিক চিত্র: ঔপনিবেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ ও মানবিক সংকটের প্রতিফলন

Mitali Singha

Mail: mitalisingha27@gmail.com

সারসংক্ষেপ: *বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে সমকালীন সমাজের বহুমাত্রিক বাস্তবতাকে অত্যন্ত গভীরতা ও সংবেদনশীলতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন। বিশেষত তাঁর গল্পগুলিতে অর্থনৈতিক সংকট, ঔপনিবেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ, মধ্যবিত্তের অবক্ষয় এবং মানবিক মূল্যবোধের পতন সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে তাঁর নির্বাচিত কয়েকটি গল্প—'রাঙামাসীমা', 'বাইশে শ্রাবণ', 'আপেক্ষিক', 'স্বপ্নসম্ভব', 'রঙিন ঘাট' ও 'ডিম'—এর আলোকে তৎকালীন অর্থনৈতিক বাস্তবতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আলোচনায় দেখা যায় যে, অর্থনৈতিক পরিবর্তন কেবল সমাজের বাহ্যিক কাঠামোকেই নয়, মানুষের মনোজগৎ ও নৈতিকতাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে।*

মূল শব্দ: *নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অর্থনৈতিক চিত্র, দুর্ভিক্ষ, ঔপনিবেশিক শোষণ, মধ্যবিত্ত সমাজ, দারিদ্র্য, শ্রমিক শ্রেণি, সামাজিক সংকট।*

ভূমিকা: ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস মূলত শোষণ, বৈষম্য, এবং ক্রমবর্ধমান সংকটের এক বহুমাত্রিক ও জটিল কাহিনী। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অধীনে ভারতবর্ষকে একটি কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং প্রস্তুত পণ্যের বাজার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক কাঠামো দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে এবং এক গভীর নির্ভরশীলতার সম্পর্ক সৃষ্টি করে। ফলে দেশীয় উৎপাদন ব্যবস্থা ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অর্থনীতির ভিত নড়বড়ে হয়ে যায়।

বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪–১৯১৮) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯–১৯৪৫)-এর সময় ভারতের অর্থনীতি এক গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধ পরিচালনার জন্য বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদের প্রয়োজন অনুভব করে এবং তার অধিকাংশই তারা ভারতের উপর চাপিয়ে দেয়। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে ভারতে মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পায়, আমদানি-রপ্তানি ব্যাহত হয়, এবং বাজারে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়। এর ফলে খাদ্য, বস্ত্র এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়।

এই পরিস্থিতির সবচেয়ে বড় শিকার হয় কৃষক, শ্রমিক এবং নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী। কৃষকরা একদিকে যেমন ফসলের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়, অন্যদিকে জমিদার ও মহাজনের শোষণের শিকার হয়। শ্রমিক শ্রেণি কম মজুরি ও অমানবিক পরিবেশে কাজ করতে বাধ্য হয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণিও বেকারত্ব ও আর্থিক অনিশ্চয়তার কারণে সংকটের মুখে পড়ে।

এই সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকট কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এর গভীর প্রভাব পড়ে সামাজিক ও নৈতিক কাঠামোর উপর। পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক মূল্যবোধ এবং মানবিকতা—সবকিছুই এই অর্থনৈতিক চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই জটিল অর্থনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাই কথাশিল্পী নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পসমূহে। তাঁর রচনাগুলি নিছক কল্পনার ফসল নয়; বরং সমকালীন সমাজের এক বাস্তব দলিল। তিনি তাঁর গল্পে দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ, বেকারত্ব,

এবং সামাজিক বৈষম্যের যে চিত্র অঙ্কন করেছেন, তা একদিকে যেমন ঐতিহাসিক সত্যের প্রতিফলন, অন্যদিকে তেমনি মানবজীবনের অন্তর্গত বেদনা ও সংগ্রামের এক গভীর শিল্পিত প্রকাশ।

ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক শোষণ ও কৃষকের দুর্দশা: ঔপনিবেশিক শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতের অর্থনৈতিক সম্পদকে শোষণ করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে তারা কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং কৃষকদের উপর নানা প্রকার কর ও চাপ সৃষ্টি করে। বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ সরকার ভারতের উপর বিপুল সামরিক ব্যয়ভার চাপিয়ে দেয়, যার ফলে অর্থনৈতিক শোষণ তীব্রতর রূপ ধারণ করে।

যুদ্ধকালীন বিশ্ববাজারের অস্থিরতার কারণে পাট, তুলা, তৈলবীজসহ বিভিন্ন কৃষিজ পণ্যের রপ্তানি হ্রাস পায়। ফলে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য মূল্য থেকে বঞ্চিত হয়। এর পাশাপাশি জমিদার ও মহাজনরা নিজেদের ক্ষতি পূরণের জন্য কৃষকদের উপর অতিরিক্ত খাজনা ও সুদের বোঝা চাপিয়ে দেয়। ফলে কৃষক সমাজ ক্রমশ ঋণের ফাঁদে আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ১৯১১ থেকে ১৯২৫ সালের মধ্যে কৃষকদের ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। ঋণ শোধ করতে না পারায় বহু কৃষক তাদের জমি বিক্রি বা বন্ধক রাখতে বাধ্য হয় এবং ধীরে ধীরে ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়। জমির খণ্ডীকরণ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কমে যায়, যা উৎপাদন হ্রাসের অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ফসলহানি এবং মূল্যবৃদ্ধি কৃষকদের অবস্থাকে আরও শোচনীয় করে তোলে। ১৯১৮–১৯১৯ এবং ১৯২০–১৯২১ সালে ফসলহানির ফলে খাদ্যসংকট দেখা দেয়। উৎপাদন কম হলেও শস্য রপ্তানি অব্যাহত থাকায় দেশে অভাব ও দুর্মূল্য বৃদ্ধি পায়।

এই সমস্ত কারণ মিলিয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের কৃষি অর্থনীতি এক গভীর সংকটে পতিত হয়, যার চরম পরিণতি আমরা দেখতে পাই ১৩৫০ বঙ্গাব্দের (১৯৪৩) ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে। এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ মানুষ, বিশেষত কৃষক ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী, অনাহার ও অপুষ্টির শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই গ্রামীণ দারিদ্র্যের নির্মম বাস্তবতাকে তাঁর গল্পে জীবন্ত করে তুলেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, খাজনা আদায়ের পরিবর্তে কখনও কখনও জমিদারদের কৃষকদের খাদ্য দিতে হয়েছে—যা অর্থনৈতিক সংকটের গভীরতাকে স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে।

তাঁর গল্পে কৃষকের জীবন শুধু অর্থনৈতিক দারিদ্র্যের নয়, বরং এক অস্তিত্ব সংকটের প্রতিচ্ছবি। সেখানে ক্ষুধা, ঋণ, শোষণ এবং অনিশ্চয়তা মিলিয়ে এক ভয়াবহ বাস্তবতা সৃষ্টি হয়েছে, যা পাঠককে গভীরভাবে নাড়া দেয়।

শিল্প ও শ্রমিক শ্রেণির সংকট: ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পায়ন ছিল সীমিত, অসম এবং সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ স্বার্থনির্ভর। ব্রিটিশ সরকার কখনই ভারতে পূর্ণাঙ্গ শিল্পায়নের পক্ষে ছিল না; বরং তারা এমন একটি শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলে, যা ব্রিটিশ শিল্পের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। ফলে ভারতীয় শিল্পের বিকাশ প্রধানত পাট, তুলা, কয়লা এবং চা—এই কয়েকটি ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় আমদানি হ্রাস পেলেও যুদ্ধের চাহিদা মেটাতে গিয়ে দেশীয় শিল্পের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। কিন্তু পর্যাপ্ত প্রযুক্তি ও বিনিয়োগের অভাবে এই শিল্পগুলো কাঙ্ক্ষিত উন্নতি করতে পারেনি। উপরন্তু, ব্রিটেনের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতায় ভারতীয় শিল্প ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ে।

১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মহামন্দা ভারতীয় শিল্পের উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলে। পণ্যের দাম কমে যায়, মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাজারে স্থবিরতা সৃষ্টি হয়। ফলে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়।

এই পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণির জীবনযাত্রা অত্যন্ত করুণ হয়ে ওঠে। তারা অল্প মজুরিতে দীর্ঘ সময় কাজ করতে বাধ্য হয় এবং কর্মপরিবেশ ছিল অস্বাস্থ্যকর ও ঝুঁকিপূর্ণ। মূল্যস্ফীতির কারণে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেলেও তাদের মজুরি সেই অনুপাতে বাড়েনি। ফলে তাদের বাস্তব আয় হ্রাস পায় এবং জীবনযাত্রার মান ক্রমশ অবনতি ঘটে।

এই অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও শোষণের ফলে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পায় এবং তারা ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে শুরু করে। বিভিন্ন স্থানে ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, যা একদিকে যেমন তাদের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম, অন্যদিকে তেমনি শ্রেণি-সচেতনতার বিকাশেরও প্রতিফলন।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পে এই শ্রমিক শ্রেণির দুর্দশা ও সংগ্রামকে অত্যন্ত বাস্তবভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর রচনায় শ্রমিকরা কেবল অর্থনৈতিক শোষণের শিকার নয়, বরং তারা এক বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থার নিপীড়িত প্রতিনিধি। তাদের জীবন সংগ্রাম, বঞ্চনা এবং প্রতিবাদ তাঁর গল্পগুলিকে গভীর মানবিকতা ও বাস্তবতার সঙ্গে সমৃদ্ধ করেছে।

মধ্যবিত্ত সমাজের অবক্ষয়: 'রাঙামাসীমা' গল্পের বিশ্লেষণ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাঙামাসীমা' গল্পটি মধ্যবিত্ত সমাজের অর্থনৈতিক সংকটজনিত নৈতিক অবক্ষয়ের এক মর্মস্পর্শী দলিল। গল্পটির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক শিক্ষিত কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল কথক, যার ব্যক্তিগত দারিদ্র্য তাকে ক্রমশ মানবিকতা থেকে বিচ্যুত করে তোলে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি সাধারণত নৈতিকতা, সংস্কার ও মানবিক মূল্যবোধের ধারক হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক চাপ ও অনিশ্চয়তা এই মূল্যবোধগুলিকে ভেঙে দিতে পারে—এই সত্যটিই লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। কথক একসময় রাঙামাসীমার কাছ থেকে যে মাতৃস্নেহ ও সহানুভূতি পেয়েছিল, তা তার জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি। কিন্তু বর্তমানের কঠিন বাস্তবতা—বেকারত্ব, অনিশ্চিত আয়, পারিবারিক চাপ—তাকে সেই স্মৃতির প্রতি নিষ্ঠুর করে তোলে।

গল্পে দেখা যায়, কথক নিজেই যখন অর্থনৈতিক দুরবস্থার মধ্যে জর্জরিত, তখন সে অন্যের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর মানসিকতা হারিয়ে ফেলে। রাঙামাসীমার ছেলে বিনয়ের সাহায্যের আবেদন তার কাছে একপ্রকার বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এখানে অর্থনৈতিক সংকট মানুষের মানসিকতাকে কীভাবে সংকীর্ণ ও আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে, তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তবে গল্পের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো রাঙামাসীমার চরিত্র। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি তাঁর মানবিকতা হারাননি। নিজের সামর্থ্যের সীমার মধ্যে থেকেও তিনি কথকের জন্য খাদ্যসামগ্রী রেখে যান। এই ঘটনাটি মধ্যবিত্তের অবক্ষয়ের বিপরীতে এক চিরন্তন মানবিকতার প্রতীক হিসেবে কাজ করে।

অতএব, 'রাঙামাসীমা' গল্পে অর্থনৈতিক সংকট কেবল একটি পটভূমি নয়; বরং এটি মানুষের নৈতিকতা, সম্পর্ক এবং মানবিকতার উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তারকারী একটি শক্তি হিসেবে চিত্রিত হয়েছে।

দারিদ্র্য ও নৈতিক স্খলন: 'বাইশে শ্রাবণ': 'বাইশে শ্রাবণ' গল্পটি দারিদ্র্য ও নৈতিক স্খলনের এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। এখানে শকুন্তলা নামক এক মেধাবী ছাত্রীকে কেন্দ্র করে লেখক দেখিয়েছেন, কীভাবে অর্থনৈতিক সংকট একজন মানুষের আত্মপরিচয়, নৈতিকতা এবং মানসিক স্থিতিকে ভেঙে দিতে পারে।

গল্পের পটভূমিতে রয়েছে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যা কবিগুরুর স্মৃতিকে ঘিরে নির্মিত। এই অনুষ্ঠানটি একদিকে যেমন পবিত্রতা, সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক চেতনার প্রতীক, অন্যদিকে শকুন্তলার ব্যক্তিগত জীবন তার সম্পূর্ণ বিপরীত—দারিদ্র্য, অস্থিরতা এবং অপমানের এক কঠিন বাস্তবতা। এই দ্বৈততা গল্পে এক তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে, যা পাঠককে গভীরভাবে প্রভাবিত করে।

শকুন্তলার পারিবারিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়—অসুস্থ পিতা, অসামাজিক ভাই, অপুষ্টিতে জীর্ণ পরিবার, এবং অন্ধকার, সংকীর্ণ বাসস্থান। এই পরিবেশ তার মানসিক জগতে এক ধরনের দমবন্ধ করা চাপ সৃষ্টি করে। ফলে সে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এক ধরনের মুক্তি খুঁজতে চায়।

কিন্তু বাস্তবতার নির্মমতা তাকে সেই মুক্তি পেতে দেয় না। অভাবের তাড়নায় সে নিজের নৈতিকতার বিরুদ্ধে গিয়ে চুরি করতে বাধ্য হয়। এই চুরিটি শুধুমাত্র একটি অপরাধ নয়; বরং এটি এক গভীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংকটের প্রতিফলন।

চুরির পর শকুন্তলার মধ্যে যে আত্মগ্লানি ও মানসিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়, তা লেখক অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরেছেন। সে নিজের অপরাধকে ক্ষমা করতে পারে না এবং এক গভীর আত্মদহনের মধ্যে ভুগতে থাকে। এই আত্মগ্লানি প্রমাণ করে যে, তার নৈতিকতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়নি; বরং তা অর্থনৈতিক চাপে বিকৃত হয়েছে।

এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন যে দারিদ্র্য শুধু শরীরকে নয়, মনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে। এটি মানুষের আত্মসম্মান, নৈতিকতা এবং স্বপ্নকে ধ্বংস করে দেয়। ফলে 'বাইশে শ্রাবণ' কেবল একটি ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডির গল্প নয়, বরং এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি।

নৈতিকতার আপেক্ষিকতা: 'আপেক্ষিক' গল্প: 'আপেক্ষিক' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আধুনিক জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ সত্য তুলে ধরেছেন—নৈতিকতা কোনো স্থির বা চিরন্তন বিষয় নয়; বরং এটি পরিস্থিতি ও মানসিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল।

গল্পের নায়ক একজন সাধারণ কর্মচারী, যার জীবনে প্রমোশন পাওয়ার আশাই ছিল একমাত্র প্রেরণা। এই আশাই তাকে নৈতিক ও সংবেদনশীল মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছিল। কিন্তু যখন সে জানতে পারে যে প্রমোশনটি সে পায়নি, তখন তার মানসিক অবস্থায় এক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটে।

এই পরিবর্তনের ফলে তার নৈতিক বোধ ক্ষীণ হয়ে যায় এবং সে নিষ্ঠুর আচরণে লিপ্ত হয়। একটি নিরীহ প্রাণীর প্রতি তার সহিংস আচরণ এই মানসিক পরিবর্তনের প্রতীক। এখানে লেখক দেখিয়েছেন, মানুষের নৈতিকতা অনেকাংশেই তার সাফল্য, নিরাপত্তা এবং মানসিক স্থিতির উপর নির্ভরশীল।

গল্পটির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক বাস্তবতা। নায়কের ব্যর্থতার পেছনে ব্যক্তিগত অযোগ্যতার চেয়ে বেশি দায়ী সামাজিক দুর্নীতি ও পক্ষপাতিত্ব। ফলে তার হতাশা আরও তীব্র হয় এবং সে সমাজের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে।

এই গল্পটি আধুনিক জীবনের অনিশ্চয়তা, প্রতিযোগিতা এবং মানসিক চাপের এক বাস্তব প্রতিফলন। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যর্থতা মানুষের নৈতিক কাঠামোকে ভেঙে দিতে পারে এবং তাকে এক ভিন্ন সত্তায় রূপান্তরিত করতে পারে।

সামাজিক বিচ্যুতি ও পরিচয় সংকট: 'স্বপ্নসম্ভব': 'স্বপ্নসম্ভব' গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় অর্থনৈতিক ব্যর্থতা এবং সামাজিক চাপের ফলে সৃষ্ট পরিচয় সংকট ও মানসিক বিচ্যুতিকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

গল্পের দুই প্রধান চরিত্র—নীলু নন্দী ও শ্যামদত্ত—দুজনেই নিজেদের বাস্তব জীবনে ব্যর্থ। কিন্তু সমাজে সম্মান ও স্বীকৃতি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তারা নিজেদের জন্য একটি কল্পিত পরিচয় তৈরি করে। এই মিথ্যা পরিচয়ের মাধ্যমে তারা নিজেদের কাছে এবং অন্যের কাছে সফল ও প্রতিষ্ঠিত হিসেবে উপস্থাপন করতে চায়।

এই প্রবণতা মূলত অর্থনৈতিক ব্যর্থতা ও সামাজিক প্রত্যাশার ফল। সমাজে সফলতার একটি নির্দিষ্ট মানদণ্ড রয়েছে, যা পূরণ করতে না পারলে মানুষ নিজেকে হীনমন্য মনে করে। এই হীনমন্যতা থেকেই জন্ম নেয় মিথ্যা পরিচয় এবং আত্মপ্রবঞ্চনা।

গল্পে দেখা যায়, এই কল্পিত জগৎ খুব বেশি সময় স্থায়ী হয় না। বাস্তবতার মুখোমুখি হওয়ার মুহূর্তে তাদের সমস্ত মিথ্যা ভেঙে পড়ে। এই ভাঙন শুধু তাদের সামাজিক পরিচয়কেই নয়, তাদের মানসিক স্থিতিকেও ধ্বংস করে দেয়।

'স্বপ্নসম্ভব' গল্পটি মূলত আধুনিক সমাজের এক গভীর সংকটের প্রতিফলন, যেখানে মানুষ বাস্তবতা থেকে পালিয়ে একটি কল্পিত জগতে আশ্রয় নিতে চায়। কিন্তু সেই আশ্রয় স্থায়ী নয়; বরং তা আরও গভীর সংকটের জন্ম দেয়।

অতএব, এই গল্পে অর্থনৈতিক ব্যর্থতা কেবল একটি ব্যক্তিগত সমস্যা নয়; বরং এটি সামাজিক ও মানসিক সংকটের একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

দুর্ভিক্ষ ও গণবিক্ষোভ: 'রঙিন ঘাট'—অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে সামাজিক বিস্ফোরণ: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রঙিন ঘাট' গল্পটি কেবল একটি দুর্ভিক্ষের বিবরণ নয়; এটি এক গভীর অর্থনৈতিক সংকটের সামাজিক প্রতিক্রিয়ার এক শৈল্পিক দলিল। এখানে দুর্ভিক্ষ কোনো বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয় নয়, বরং ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নীতির ফলস্বরূপ সৃষ্ট এক মানবসৃষ্ট সংকট। কৃষি উৎপাদনের ঘাটতি, যুদ্ধকালীন বাজারব্যবস্থার অস্থিরতা এবং শোষণমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো—এই সবকিছুর সম্মিলিত প্রভাবে গ্রামীণ অর্থনীতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে।

গল্পে আমরা দেখি, খাদ্যাভাব এমন চরমে পৌঁছায় যে মানুষের বেঁচে থাকার মৌলিক প্রবৃত্তি সমস্ত সামাজিক নিয়ম ও নৈতিকতার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ আর "মানুষ" থাকে না—সে পরিণত হয় এক প্রতিবাদী শক্তিতে, যা কোনো আইন বা সামাজিক নিয়মকে মানতে রাজি নয়। হাট লুঠের ঘটনা এই মানসিক অবস্থারই বহিঃপ্রকাশ। এটি নিছক অপরাধ নয়; বরং এটি এক ধরনের অর্থনৈতিক বিদ্রোহ—যেখানে ক্ষুধার্ত জনগণ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সংঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে।

গল্পের বর্ণনায় দুর্ভিক্ষের দ্বৈত রূপ—"হত্যা" ও "আত্মহত্যা"—বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। এই দ্বৈততা বোঝায় যে অর্থনৈতিক সংকট কেবল বাহ্যিক সহিংসতা সৃষ্টি করে না, বরং মানুষের অন্তর্জগতেও ধ্বংস ডেকে আনে। একদিকে মানুষ অন্যকে আক্রমণ করে খাদ্য লুঠ করছে, অন্যদিকে হতাশা ও অনাহারের চাপে নিজেকেও ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

এখানে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ আসলে এই ক্ষুধার্ত মানুষের ওপর আরও দমন-পীড়নের রূপ নেয়। গুলির মুখে "মহা-নির্বাণ" লাভের যে চিত্র গল্পে উঠে আসে, তা রাষ্ট্রের নির্মম উদাসীনতার এক করুণ প্রতীক। ফলে 'রঙিন ঘাট' গল্পটি আমাদের সামনে স্পষ্ট করে যে, অর্থনৈতিক বঞ্চনা যখন চরমে পৌঁছায়, তখন তা অবশ্যম্ভাবীভাবে সামাজিক অস্থিরতা, সহিংসতা এবং গণবিক্ষোভের জন্ম দেয়।

চরম দারিদ্র্য ও মানবিক বিপর্যয়: 'ডিম'—ক্ষুধার নির্মম বাস্তবতার এক প্রতীকী আখ্যান: 'ডিম' গল্পটি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টিশীল প্রতিভার এক অনন্য নিদর্শন, যেখানে দুর্ভিক্ষ ও অর্থনৈতিক শোষণের চরম রূপ অত্যন্ত নির্মম বাস্তবতায় ফুটে উঠেছে। এই গল্পে "ডিম" একটি সাধারণ খাদ্যবস্তু নয়; এটি জীবনের প্রতীক, আবার একই সঙ্গে এটি বেঁচে থাকার সংগ্রামের নির্মম ব্যঙ্গচিত্র।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র রজনী—একজন দরিদ্র, অসহায়, শ্রমজীবী মানুষ—যার জীবন দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত। তার প্রতিদিনের সংগ্রাম কেবল অন্নের জন্য নয়, বরং অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য। একটি ডিম সংগ্রহ করার জন্য তার যে অসীম কষ্ট ও শ্রম, তা মূলত সেই বৃহত্তর অর্থনৈতিক কাঠামোর প্রতিফলন, যেখানে দরিদ্র মানুষদের শ্রম ও জীবন ধনতান্ত্রিক ও ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার কাছে সম্পূর্ণ তুচ্ছ।

গল্পের সবচেয়ে মর্মান্তিক দিক হলো—একটি ডিমকে কেন্দ্র করে পারিবারিক সম্পর্কের ভাঙন এবং মানবিকতার চূড়ান্ত বিপর্যয়। ক্ষুধার তাড়নায় রজনী নিজের নাতিকে হত্যা করতে উদ্যত হয়—এই ঘটনা মানবিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ অবক্ষয়ের প্রতীক। এখানে লেখক দেখাতে চেয়েছেন যে, দারিদ্র্য শুধু শরীরকে নয়, মানুষের মন ও বিবেককেও ধ্বংস করে দেয়।

অন্যদিকে, এই গল্পে ধনী ও দরিদ্রের বৈপরীত্য অত্যন্ত তীব্রভাবে উপস্থিত। একদিকে সামরিক বাহিনীর বিলাসিতা—যেখানে ডিম দিয়ে কেক তৈরি হয়; অন্যদিকে রজনীর মতো মানুষের কাছে একটি ডিমও অধরা। এই বৈপরীত্য ঔপনিবেশিক অর্থনীতির গভীর বৈষম্যকে নগ্নভাবে প্রকাশ করে।

প্যারীলালের চরিত্র এখানে মধ্যবর্তী শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি, যে নিজে সরাসরি শাসক না হলেও শোষণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করে। তার লোভ ও দায়িত্বজ্ঞানহীনতা রজনীর মতো মানুষের ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে। ফলে 'ডিম' গল্পটি শুধু ব্যক্তিগত ট্র্যাজেডি নয়; এটি একটি বৃহত্তর সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার নির্মম সমালোচনা।

শোষক ও শোষিত সমাজের দ্বন্দ্ব: শ্রেণি-বিভাজনের নির্মম বাস্তবতা: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—সমাজকে শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করে দেখানো। এই বিভাজন কেবল অর্থনৈতিক নয়; এটি সামাজিক, নৈতিক এবং মানসিক স্তরেও গভীরভাবে প্রভাব ফেলে।

শোষক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করে প্যারীলালের মতো চরিত্ররা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য দরিদ্র মানুষের শ্রমকে ব্যবহার করে। তারা সরাসরি শাসক না হলেও শাসনব্যবস্থার সুবিধাভোগী এবং সেই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাদের মধ্যে মানবিকতা বা সহানুভূতির অভাব স্পষ্ট; তাদের কাছে মানুষ নয়, মুনাফাই প্রধান।

অন্যদিকে, রজনীর মতো চরিত্ররা শোষিত শ্রেণির প্রতিনিধি—যারা জীবনের প্রয়োজনে নিজেদের শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হয় এবং শোষণের শিকার হয়। তাদের জীবনে কোনো নিরাপত্তা নেই, নেই ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা। তারা কেবল বর্তমানের ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকে।

এই দুই শ্রেণির মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য যত বাড়ে, এই সংঘাত তত তীব্র হয়। কখনও তা নীরব অসন্তোষ হিসেবে প্রকাশ পায়, আবার কখনও তা সহিংস বিদ্রোহে রূপ নেয়—যেমন 'রঙিন ঘাট' গল্পে দেখা যায়।

লেখক এই দ্বন্দ্বকে কেবল সামাজিক বাস্তবতা হিসেবে তুলে ধরেননি; তিনি এর নৈতিক তাৎপর্যও বিশ্লেষণ করেছেন। শোষণ শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতি করে না; এটি সমাজের নৈতিক ভিত্তিকেও দুর্বল করে দেয়। ফলে সমাজে এক গভীর অসাম্য ও অবিচারের পরিবেশ তৈরি হয়।

অর্থনৈতিক সংকট ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়: অন্ধকারের মধ্যেও আলোর সন্ধান: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতে বারবার যে বিষয়টি ফিরে আসে, তা হলো—অর্থনৈতিক সংকটের ফলে মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়। দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং অনিশ্চয়তা মানুষকে ক্রমশ স্বার্থপর, নিষ্ঠুর এবং কখনও অপরাধপ্রবণ করে তোলে।

'রাঙামাসীমা' গল্পে আমরা দেখি, দারিদ্র্য কীভাবে একজন মানুষকে তার অতীতের সম্পর্ক ও মানবিকতার প্রতি উদাসীন করে তোলে। 'বাইশে শ্রাবণ'-এ দারিদ্র্য একজন মেধাবী ছাত্রীকে চুরির মতো কাজে বাধ্য করে। 'আপেক্ষিক'-এ অর্থনৈতিক ব্যর্থতা একজন মানুষকে নৈতিকভাবে অধঃপতিত করে। 'ডিম'-এ ক্ষুধা মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে আনে।

তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও লেখক সম্পূর্ণ নিরাশাবাদী নন। তিনি দেখিয়েছেন যে, মানবিকতার ক্ষীণ আলো এখনও নিভে যায়নি। 'রাঙামাসীমা'-র নিঃস্বার্থ ভালোবাসা, শকুন্তলার আত্মগ্লানি, কিংবা রজনীর অন্তর্দ্বন্দ্ব—এই সবকিছুই প্রমাণ করে যে মানুষের মধ্যে মানবিকতার বীজ এখনও বিদ্যমান।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পগুলি কেবল হতাশার চিত্র নয়; বরং এগুলি এক ধরনের মানবতাবাদী আখ্যান, যেখানে সংকটের মধ্যেও মানুষের মানবিক সত্তার অস্তিত্বকে স্বীকার করা হয়েছে।

উপসংহার: নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে অর্থনৈতিক চিত্র কেবল একটি পটভূমি নয়, বরং মূল বিষয়বস্তু। তাঁর রচনায় ঔপনিবেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং সামাজিক বৈষম্যের বাস্তব চিত্র ফুটে উঠেছে। এই গল্পগুলি আমাদের দেখায় যে অর্থনীতি কেবল মানুষের জীবিকার বিষয় নয়, বরং তা মানুষের নৈতিকতা, সম্পর্ক ও মানসিকতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। তাঁর গল্পগুলি আজও প্রাসঙ্গিক, কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক সংকট এখনও আমাদের সমাজে বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

- চক্রবর্তী, অরুণকুমার। (n.d.). *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*। কলকাতা: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস (বাংলা সংস্করণ)।
- চট্টোপাধ্যায়, বিপন। (২০০৯)। *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম* (বাংলা অনুবাদ)। নয়াদিল্লি: ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান।
- চট্টোপাধ্যায়, বিপন। (২০১০)। *ঔপনিবেশিক ভারতের অর্থনীতি*। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।
- দাস, নীরদচন্দ্র। (২০১২)। *বাংলা ছোটগল্পে সামাজিক বাস্তবতা*। কলকাতা: সাহিত্য সংসদ।
- দত্ত, রমেশচন্দ্র। (n.d.). *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস (ঔপনিবেশিক যুগ)*। কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (n.d.). *বাইশে শ্রাবণ ও অন্যান্য গল্প*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (n.d.). *ডিম ও অন্যান্য গল্প*। কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (n.d.). *রাঙামাসীমা ও অন্যান্য গল্প*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।
- গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ। (n.d.). *শ্রেষ্ঠ গল্পসমগ্র*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।
- ভট্টাচার্য, সব্যসাচী। (২০০৪)। *বঙ্গের দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩): একটি ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ*। কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স।

- মুখোপাধ্যায়, সুমিত সরকার। (২০০৮)। *আধুনিক ভারতের ইতিহাস*। কলকাতা: কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি।
- রায়, তপন। (২০১৫)। *বাংলা কথাসাহিত্যে সমাজ ও অর্থনীতি*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি।
- সরকার, সুমিত। (২০১২)। *ঔপনিবেশিক ভারত: অর্থনীতি, সমাজ ও রাজনীতি*। নয়াদিল্লি: পারমানেন্ট ব্ল্যাক।
- সেন, অমর্ত্য। (১৯৮১)। *দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ: একটি বিশ্লেষণ* (বাংলা অনুবাদ)। নয়াদিল্লি: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।
- সেন, সুশোভন। (২০০৫)। *ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস*। কলকাতা: প্রগতি প্রকাশন।

Citation: **Singha. M.,** (2024) "নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে অর্থনৈতিক চিত্র: ঔপনিবেশিক শোষণ, দুর্ভিক্ষ ও মানবিক সংকটের প্রতিফলন" *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-2, Issue-5, June-2024.